মৃত্যু

জমকালো পোষাকপরা লোকগুলো একটার পর একটা নাম্বার বাজিয়ে চলেছে নাতিবৃহৎ মুগ্ধ জনসমাগমের সামনে দাঁড়িয়ে। অদূরে শান্ত নিস্তরঙ্গ টেমসের রজত জলধারা বয়ে চলেছে নীরবে। দীপিকা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে ক্ষিপ্র হাতে চোখের জল মুছলো। তারপর রুমালটা ব্যাগে রেখে দিয়ে আশে-পাশে চেয়ে দেখলো। সবাই মগ্ন হয়ে বাজনা শুনছে, দীপিকার অদ্ভুত আচরণ চোখে পড়েনি কারো। অদ্ভুত ছাড়া আর কি বলা যায় একে ! নৌবাহিনীর সুদক্ষ ব্যাণ্ডের উদ্দাম সামরিক বাজনা শুনে যদি কারও দু'গাল বেয়ে অবাধ্য অশ্রুধারা নেমে আসে, তবে অন্যের কাছে সেটা সৃষ্টিছাড়া বিসদৃশ ব্যাপার বলে মনে হওয়াই তো স্বাভাবিক। দীপিকা নিজেই কি এর কোন সঙ্গত কারণ দেখাতে পারে, পারে নিজের মনকে বোঝাতে !

ছোটবেলার একটি ঘটনা মনে পড়ে তার। রাঙাকাকু ছুটিতে ওদের ওখানে বেড়াতে এসেছেন। ফটো তোলার ভারী শখ ছিল রাঙাকাকুর। এনতার ফটো তুলেছেন, কোলকাতায় ফিরে গিয়ে ডেভেলপ করবেন। এদের কাছেও পাঠাবেন এক কপি করে। রাঙাকাকুর জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে ছোট্ট দীপিকা ফিল্মের ডিবে খুলে তোলা-ফটোর স্পুলটা হাতে নিতেই আর্তনাদ করে উঠলেন রাঙাকাকু। ঘাবড়ে গিয়ে ডিবেটা তাড়াতাড়ি রেখে দিল দীপিকা, স্পুলটাও। কিন্তু রাঙাকাকু সেটা তুলে নিলেন না।

বিষন্নভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, "ওটা নষ্ট হয়ে গেছে।"

দীপিকা ভেবে পায় না অক্ষত আনকোরা জিনিসটা, যাতে আঁচড়টুকু পর্যন্ত লাগেনি, হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল কেমন করে, কি ভাবে ! এক ঝলক আলোর সংস্পর্শে আসার একি নিষ্করুণ পরিণতি !

আজ দীপিকার কাছে তার নিজের জীবনটাও সেই হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়া ফটোর স্পুলের মতই মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে কিছুই তো বদলায়নি ! তার আজীবনের সাধনা ধাপে ধাপে পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী দীপিকা আজ বিশ্বের সেরা শিক্ষানিকেতনে সাদর নিঃশুল্ক প্রবেশাধিকার লাভ করেছে অনায়াসে। এবং এরপর এক এক করে আরও সম্মান ও প্রতিষ্ঠার দ্বার খুলে যাবে তার সামনে। শুধু তার জীবনের সেই আলোভরা স্বল্পায়ু অধ্যায়টুকুর আকস্মিক আবির্ভাব সবকিছু ওলটপালট করে দিয়ে গেছে অনিবার্যভাবে। অথচ কখন কিভাবে কি ঘটে গেল তা যেন নিজেও জানতে পারেনি দীপিকা।

সদ্য-বিদেশপ্রত্যাগত তরুণ প্রতিভাবান অমর্ত্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল দীপিকা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে। ইনস্টিটিউটের ফ্যাশনসর্বস্ব মেয়েগুলোকে দেখলেই বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে উঠতো। সিউডো-ইন্টেলেক্চুয়ালিজ্‌ম্‌'য়ের ঘোমটার আড়ালে নারীজাতির সেই চিরন্তন সাধনা, বরলাভের অক্লান্ত প্রয়াস। আত্মসর্বস্ব বাক্যবিলাসী ছেলেগুলোকে আরও অসহ্য লাগতো তার। এদের মাঝে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল দীপিকার। কবে সাত সমুদ্র পারে গিয়ে মুক্ত বায়ুতে শ্বাস নেবে, কোমর বেঁধে নিশ্চিন্তে পড়াশোনার কাজে নামবে, তারই দিন গুনছিল সে।

সেই স্বপ্নভূমি থেকে সদ্য ফিরে আসা অমর্ত্য তাই নিদারুণভাবে টেনেছিল তাকে। অমর্ত্যরও দেশে ফিরে ভাল লাগছিল না মোটে। দূর থেকে দেশকে যতই ভালবাসুক, ভক্তি করুক, দেশবাসীর সান্নিধ্যে এসে তার সব শুভসঙ্কল্প, সদিচ্ছা, সম্প্রীতি দ্রুত উবে যাচ্ছিল কর্পূরের মত। দীপিকারও সারা মন প্রাণ তখন উন্মুখ হয়ে আছে বিদেশের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বারতা শোনার জন্যে। সে তখন যাত্রার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছে, এখানে ওখানে এ্যাপ্লিকেশন ছাড়ছে, ইন্টারভিউ দিয়ে আসছে আকছার। এর মধ্যে একটা না একটা লেগে যাবেই সে বিষয়ে একেবারে ধ্রুব নিশ্চিত সে। অমর্ত্যর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাই আগেভাগেই সবকিছু জেনেশুনে-চিনে রাখতে চায় দীপিকা। অমর্ত্য ধন্য, কৃতার্থ হয়ে যায় এমন একজন উৎসুক, উন্মুখ শ্রোতা পেয়ে। কারণ তার মন প্রাণ তখনো পড়ে আছে সেই সুদূর লণ্ডনে, মানুষটা তার স্থূল শরীরেই শুধু এখানে উপস্থিত রয়েছে যেন।

এমনি করে দিন কাটে। অমর্ত্য বলে আর দীপিকা শোনে। বক্তা আর শ্রোতা। অমর্ত্য আর দীপিকা। এরই মধ্যে কখন যেন সবকিছু তোলপাড় একাকার হয়ে যায়। অমর্ত্যর অতীতের স্মৃতিচারণ আর দীপিকার ভবিষ্যতের স্বপ্ন মিলে যায় একই কেন্দ্রবিন্দুতে। বাক্যালাপ থেকে হয়ে যায় বাগ্‌দান। দিনগুলো যেন উড়ে চলেছে সুপারসনিক বিমানের গতিতে। এপ্রিলের শেষদিকে খবর এলো দীপিকা লণ্ডনে পড়াশোনা করার জন্যে স্কলারশিপ পেয়েছে। স্কলারশিপের মেয়াদ শুরু হবে সেপ্টেম্বরে। দীপিকা তখন নিভৃতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে ভাবী বধূরূপটাকে কল্পনা করে মুগ্ধ লজ্জা ও আবেশে রাঙা হ'চ্ছে। খবরটা পেয়ে খুব একটা আহ্লাদ প্রকাশ করলো না সে। এখন আর সে মোটেই বিলেত যেতে ইচ্ছুক নয়। বিয়ে করে ঘর-সংসার পেতে বসবে, ছেলেপুলে হ'লে ইন্সিটিটিউটের কাজটাও ছেড়ে দেবে দীপিকা। অমর্ত্যের একার উপার্জনেই কুলিয়ে নেবে সুগৃহিণীর কুশলতায়।

এপ্রিল শেষ হ'ল। আরও ক'টা দিন কেটে গেছে। তেরই মে বিয়ে করবে তারা। জাতের অমিল। অভিভাবকদের সঙ্গে বাদানুবাদ করার ধৈর্য তাদের নেই। বিয়েটা রেজিস্ট্রি করে আগেই সেরে নেবে। তার পর যা হ'বার হ'বে।

এগারোই মে বিকেলের দিকে কনট্ প্লেস থেকে বাজার-হাট সেরে আইসক্রীম খেয়ে ফিরছিল ওরা মোটর সাইকেলে। হঠাৎ একটা দৈত্যাকৃতি বাস উল্টো দিক থেকে এসে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা লাগালো। নিমেষে অমানিশা নেমে এলো ওদের চারিদিক ঘিরে। পরদিন হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে এলো দীপিকার। ওর অবিরত প্রশ্নে শেষ অবধি ওকে খবরটা জানাতে বাধ্য হ'ল হাসপাতালে উপস্থিত দীপিকার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা। অমর্ত্য নেই। তার দেহটাকেও একবার শেষ দেখা দেখতে পেলো না দীপিকা।

ঘড়ির কাঁটার মত সময়কে পিছন দিকে চালানো যায় না। এক সময় দীপিকার জীবনে কত কিছু ছিল। তারপর তার সব আশা, আকঙ্খা, স্বপ্ন একত্রিত ঘনীভূত হ'ল একটি মানুষকে কেন্দ্র করে। সে মানুষ চলে যেতে তারা আগের মত ছড়িয়ে পড়লো না। একেবারে হারিয়ে গেল চিরদিনের মত। হঠাৎ ভুল করে রাঙাকাকুর ঝকঝকে ডিবে থেকে বার

করা সেই নষ্ট হয়ে যাওয়া ফিল্মের মত সুশ্রী অল্পবয়সী মেধাবী মেয়েটার বুকভরা হাহাকারের বাহ্যিক কোনও প্রকাশ ছিল না।

যথাসময়ে লণ্ডনে এসে পড়াশোনা শুরু করলো দীপিকা। নিজেকে ঢেলে দিল কাজের মধ্যে। শুধু ছুটি-ছাটার দিনগুলোতে বেরিয়ে পড়তো। বাসে কিংবা টিউবে চড়ে চলে আসতো কোনদিন হিপোড্রোমে, কোনদিন কিউগার্ডেনে কিংবা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অথবা ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারিতে। কখনো বা টেমসের ধারে ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেন্টে, যেমন আজ এসেছে। লণ্ডনে এবং লণ্ডনের আশেপাশে আরও বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে, কিন্তু দীপিকার বিন্দুমাত্র কৌতুহল বা উৎসাহ নেই তাদের সম্বন্ধে। সে তো ট্যুরিস্ট নয়, সে তীর্থযাত্রী। তার উদ্দেশ্য দর্শনীয় স্থান দেখা নয়, সে কুড়িয়ে ফিরছে অমর্ত্য রায় নামে একটি স্মৃতির বিক্ষিপ্ত কণিকাগুলি। তাই ব্যাণ্ডের বাজনা ছাপিয়ে তার কানে ভেসে আসে কোন হারিয়ে যাওয়া কন্ঠস্বর আর দু'চোখ জলে ভরে ওঠে বারবার।

"এক্সকিউজ মি, আর ইউ ফ্রম ইণ্ডিয়া?"

অপরিচিতার আচমকা প্রশ্নে অতীতের আকাশ থেকে মাটির জগতে ফিরে এলো দীপিকা। কালো ভেলভেটের রিবন দিয়ে আটকানো ঢেউ খেলানো সোনালী চুলের ফ্রেমে সদ্যফোটা শতদলের মত কোমল ও তাজা একখানা মুখ উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছে ওর পানে। নীল দু'চোখের গভীরে মমতা আর বিষাদের সমন্বয়। তার কোলের শিশুটি বড় বড় কালো চোখ মেলে উৎসুক দৃষ্টিতে দেখছে দীপিকাকে। দীপিকা হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে আদর করলো। তার বুকের মাঝে অন্তহীন হাহাকার জেগে উঠলো।

মাথা নেড়ে বিদেশিনীর প্রশ্নের জবাব দিল, "হ্যাঁ, আমি ভারতীয়।"

বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে দীপিকার পাশে ঘাসের ওপর বসে পড়লো মেয়েটা। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছলো। তারপর বলতে লাগলো নিজের ইতিকথা।

"জানো, ইণ্ডিয়াকে আমি সারা অন্তর দিয়ে ভালবাসি। এতদিনে আমার সেখানেই থাকার কথা। পুরোপুরি ইণ্ডিয়ানই হয়ে যেতাম আমি, কিন্তু আমার ভাগ্য মন্দ। সুখের নৌকায় পা রাখামাত্র ভরাডুবি হ'ল।"

মেয়েটির নাম জেনিফার। সুইস কটেজে তার মার নিজস্ব বাড়ি আছে। দু'খানা ঘরে মা-মেয়ে থাকে, বাকি ঘরগুলোয় থাকে ভাড়াটেরা। ভাড়াটেরা অধিকাংশই ছাত্র। সকালে জলখাবার খেয়ে যে যার কাজে চলে যায়, রাত্রে ফিরে এসে সাপার খায়। জেনিফারের মা চাকুরে মহিলা। ভাড়াটেদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব জেনিফারের। তারা কচিৎ কখনো তাকে নিয়ে বেড়াতে যায়। সিনেমা, রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায়। এটা-সেটা প্রেজেন্ট করে।

এই ভাবেই কাটছিল দিন, হঠাৎ সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। একটি ভারতীয় ভাড়াটে জুটলো তাদের। বছর তিনেকের জন্যে এসেছে উচ্চশিক্ষার উচ্চাশা নিয়ে। সতেরো বছরের কিশোরী জেনিফারের কি যে হ'ল লাজুক মুখচোরা বিদেশী ছেলেটিকে দেখে! এর আগে হাল্কা সখ্যতার বেশী কাউকে এগোতে দেয়নি সে। মার্টির বেলায় সে নিজেই ঝাঁপ দিলো আগুনে। তিনটি বছর প্রজাপতির পাখায় উড়ে চলে গেল কখন তার হিসেব জানে না জেনিফার।

মার্টির পড়া শেষ হয়েছে, এবার তার ফিরে যাবার পালা। জেনিফারের পেটে তখন মার্টির সন্তান। প্রথমে ঠিক হয়েছিল আরও ক'মাস এদেশে কাটিয়ে বিয়েটিয়ে চুকিয়ে জেনিফার ও বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরবে মার্টি। কিন্তু শেষ অবধি মার্টি বললো সেটা সমীচীন হবে না। জেনিফার প্রথম ওদেশে যাচ্ছে, ওখানে গিয়ে যাতে কোনরকম অসুবিধে না হয় তাই মার্টি আগেভাগে গিয়ে সব কিছু ব্যবস্থা করে রাখবে এবং সবচেয়ে এবং সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন, একটা ভাল চাকরি জোগাড় করতে হবে তাকে। লণ্ডনে বসে থাকলে সেটা সম্ভব হবে না।

চোখের জলে পরস্পরের কাছে বিদায় নিলো তারা। বিচ্ছেদটা সাময়িক হলেও বুক ফেটে কান্না আসছিল জেনিফারের।

তাকে বুকে টেনে নিয়ে মার্টি বললো, "কেঁদো না জেনি, আর তো মাত্র ক'মাস। বেবী মাসখানেকের হয়ে গেলেই ওকে নিয়ে চলে এসো। আমি প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে দেবো ----।"

হায়রে, তখন কে জানতো নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতার নির্মম পরিহাস!

বেবী এলো, কিন্তু মার্টির কাছ থেকে প্লেনের টিকিট এলো না।

তার বদলে মার্টির এক বন্ধুর কাছ থেকে এলো এক লাইনের একটা কেব্‌ল্‌, "মার্টি দুর্ঘটনায় মারা গেছে।"

দুঃসহ বেদনায় কুঁকড়ে উঠলো সোনালী চুলে ঘেরা ফুটন্ত শতদল। নীল সায়রের সৈকত ভেঙে অশ্রুধারা নেমে এলো।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছে জেনিফার কাতর উদগ্রীব চোখে দীপিকার দিকে মুখ তুলে চাইলো, "তুমি তো ইণ্ডিয়া থেকে এসেছ। আমার মার্টিকে কি চিনতে তুমি? তার নাম শুনেছ?"

ব্যাগ খুলে একটা ফটো বার করে দীপিকার হাতে তুলে দিল মেয়েটা। দীপিকা একদৃষ্টে চেয়ে রইলো ছবিখানার দিকে। সেই মুখ, সেই চোখ, ঠোঁটের কোণে ঠিক সেই সকৌতুক হাসির আমেজ।

জেনিফার বলে চলেছে, "দু'বছর আগে, তিরিশে অক্টোবর সাতাত্তর সালে মার্টির সঙ্গে এয়ারপোর্টে শেষ দেখা আমার। তার মাসখানেক পরেই জানতে পারলাম সে আর নেই ----"

দীপিকার কানে কে যেন গরম সীসে ঢেলে দিচ্ছে। ছাইয়ের মত পাংশু হয়ে গেছে তার মুখ।

ফটোখানা ফেরত দিয়ে ফ্যাকাসে গলায় বললো, "না, একে আমি চিনি না। আমি দুঃখিত।"

মেয়েটি বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বাচ্চাটা দীপিকার দিকে নিটোল একটা হাত বাড়িয়ে দিল। দীপিকা ছিটকে সরে এলো। শিশুর শ্যাম-স্নিগ্ধ হাতের কোমল পরশ নয়, যেন জ্বলন্ত লৌহ শলাকা স্পর্শ করেছে সে। সারা দেহ মনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে নিদারুণ সেই দাহ। ক্ষিপ্র পায়ে রাস্তায় নেমে পড়লো দীপিকা। তারপর যন্ত্রচালিতের মত হেঁটে চললো দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে।

না, দীপিকা জেনিফারের মার্টিকে চেনে না। চেনে না অমর্ত্য রায় নামে কোন লোককে। দু'বছর আগে নিরপরাধিনী বিদেশী মেয়েটার কাছে মৃত্যুর ছলনা করেছিল যে লোকটা, গত বছর মৃত্যু নিজে থেকে এগিয়ে এসে সব জারিজুরি ভেঙে দিয়েছে তার। আর আজ, টেমস

নদীর তীরে এই সান্ধ্য সঙ্গীতের আসরে, তার স্মৃতিটুকুরও মৃত্যু ঘটলো। এই শেষের মৃত্যুটাই বুঝি সবচেয়ে মর্মন্তুদ।